ইন্দো-আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স, কলকাতা আয়োজিত সভায় মার্কিন কনসাল জেনারেল জর্জ এন সিবলির দেওয়া ভাষণ

১১ ডিসেম্বর ২০০৩

সুপ্রভাত! মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শৈলেন সরকার, ইন্দো-আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মণ্ডলা, মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তা এবং আইএসিসি-র সব সদস্য ও অভ্যাগতকে স্বাগত জানাই। আজ সকালের এই আলোচনায় আমার বক্তব্যকে ব্যাপকতর ও ক্ষুদ্রতর -- উভয় প্রেক্ষাপটেই উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে কৃষি ক্ষেত্রে বাণিজ্যের চার ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা তুলে ধরব। সুতরাং প্রথমেই আমি কৃষি ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রসঙ্গে বলব। এরপরে আমি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিস্থিতি নিয়ে কিছু বলতে চাই। পরবর্তী প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে একটি নির্দিষ্ট মার্কিন বিনিয়োগের কথা বলব, আপনারা চাইলে যাকে এক ধরণের 'সাফল্যের কাহিনী' বলা যেতে পারে। সবশেষে আমি ব্যাপকতর আঙ্গিকে কৃষি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহুপাক্ষিক আলোচনার পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করব।

তাহলে, ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক কৃষি-বাণিজ্যের বিষয়টি দিয়ে শুরু করা যাক। ভারত একশ' কোটিরও বেশি উপভোক্তার দেশ হিসাবে মার্কিন খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীর এক বিরাট বাজার। ভারতের বিপুল জনসংখ্যা ও উৎসাহজনক অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতিও ভারতে মার্কিন কৃষি-পণ্য রপ্তানির বিষয়টিকে প্রভাবিত করতে পারে। আগামী দশকের প্রতি বছরে ২০-৩৪ বছর বয়সসীমার ৭০ লক্ষ নতুন উপভোক্তার সৃষ্টি হবে ভারতে। ভারতে ক্রমশঃ নগরায়ণের আরও বিকাশ ঘটছে এবং ইদানিং অনেক মহিলা বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছেন জীবিকার সন্ধানে। দশ লক্ষ বা তার বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট ২৭টি প্রধান শহরাঞ্চল ভারতে আছে এবং ক্রয়ক্ষমতার নিরিখে ১৩ হাজার ৭৫০ ডলার মাথাপিছু আয়বিশিষ্ট মধ্যবিত্তের সংখ্যা দেড় থেকে দুই কোটি। মেরিল লিঞ্চের সাম্প্রতিক হিসাবে বলা হয়েছে, ভারতের অর্থনীতি ২০১০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে যাবে আর গোল্ডম্যান স্যাকসের ভবিষ্যদ্বানী হল, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারত হয়ে উঠবে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি। সম্মিলিতভাবে এই সব প্রবণতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন বিদেশি সরবরাহকারীদের কাছ থেকে নতুন ও উন্নতমানের খাদ্য ও পানীয়দ্রব্য যোগানের বাড়তি চাহিদা সৃষ্টি করবে।

এখনও পর্যন্ত অবশ্য এই সব সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ভারতের বাজার ছিল বিদেশ থেকে আমদানি করা খাদ্যসামগ্রীর কাছে অবরুদ্ধ। বিদেশি মদ ও অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় এখনও ভারতের বাজারে ঢোকার ছাড়পত্র পায়নি। ২০০২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৃষি বাণিজ্যে ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেনের অতিরিক্ত পরিমাণ ছিল ৮১ কোটি ডলার। বিগত ছ' বছরে ভারতে মার্কিন কৃষি পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ১৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালে দাঁড়িয়েছে ২৮ কোটি ডলারে। শতকরা হিসাবে সংখ্যাটা মনোগ্রাহী হলেও ভারতের জনসংখ্যা, ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং পূর্বে উলেখিত বিভিন্ন প্রবনতার বিচারে ডলারের অঙ্ক রয়ে গেছে হতাশাজনক ভাবে অকিঞ্চিৎকর।

মার্কিন কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির পথে প্রধান অন্তরায় হল ভারতের চড়া আমদানি শুল্ক। বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনের (ডবুটিও) সদস্যদের মধ্যে ভারতে বিভিন্ন আরোপিত শুল্কের হার সবচেয়ে বেশি।

ভারত তার বাজারকে মার্কিন কৃষি পণ্যের জন্য আরও উন্মুক্ত করলে ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে ক্রেতাদের সামনে থাকবে অনেক বেশি পছন্দের সুযোগ, জিনিসের দাম হবে কম এবং পসরায় থাকবে দুর্দান্ত সব নতুন পণ্য। আমার বক্তব্যের শেষ দিকে আমি এ সম্পর্কে কিছু কিছু প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসব।

এখন পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিটা কী রকম?

এখানে আমি অবশ্যই স্বীকার করব যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষি নীতিতে উলেখযোগ্য পরিবর্তন আনার জন্য বর্তমানে তৎপর। বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় আসে তখন তার লক্ষ্য ছিল খাদ্য সঙ্কট কবলিত অর্থনীতিতে কৃষি উৎপাদনকে চাঙ্গা করে তোলা। ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর সফল রূপায়নের দরুন এ ব্যাপারে তারা উলেখযোগ্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। অবশ্য প্রশস্তির ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তে বসে থাকার সময় এটা নয়, এবং এই সরকারও তা উপলব্ধি করেছে। সেই কারণে তারা ম্যাকিনজেকে দিয়ে কৃষি বাণিজ্যে সম্ভাবনার বিষয়ে সমীক্ষা করিয়েছে। সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট বাণিজ্য প্রসারের অবকাশ রয়েছে। কৃষি বাণিজ্য প্রসারের অনেকগুলি মডেল রয়েছে। তার একটি হল, অবিভক্ত বিরাট জমি এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রচালিত চাষের ব্যবস্থা যাতে খুব কম সংখ্যক মজুরের প্রয়োজন। এই মডেল অনুসরণ করে যে নতুন কলকাতার জন্ম হতে পারে তা বড়জোর দুই, তিন অথবা চার কোটি মানুষের বসবাসের উপযোগী এবং এটা বুঝতে বিশেষ কল্পনা শক্তির দরকার হয় না। স্বভাবতই এই মডেল এখানকার জন্য অনুপযুক্ত।

বরং লক্ষ্য হল, চাষীদের কৃষিকাজে বহাল রাখা। কিন্তু একই সঙ্গে দেখতে হবে তাদের উৎপাদন যেন এমন ধরন ও এমন মানের হয় যা কৃষি প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্পে কাজে লাগানো যায়। এগুলির মধ্যে একটা ধারাবাহিক সামঞ্জস্য থাকতে হবে। এর অর্থ হল, চুক্তিতে চাষ-আবাদ। প্রক্রিয়াকারী ও চাষীর মধ্যে এমন এক চুক্তি করতে হবে যাতে ব্যবসার জন্য উপযুক্ত উৎপাদন এবং চাষীর জন্য উচ্চতর আয়ের পথ নিশ্চিত করা যায়। মোটের ওপর, এ ধরনের চুক্তিতে যদি আরও বেশি আয়ের বন্দোবস্ত না থাকে তাহলে চাষীরা স্বেচ্ছায় কেন চুক্তিবদ্ধ হতে যাবে?

এই পরিবর্তনটা গ্রামীন অর্থনীতি বা রাজনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করলেও কিছু কিছু বাধার সম্মুখীন হয়েছে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক, কারণ, সব অদলবদলই কিছু ভাঙাচোরার মধ্য দিয়ে এগোয়। কিন্তু একবার যখন সুবিধাগুলি সকলের কাছে স্পষ্ট হবে তখন ফুল চাষ, ফল চাষ, পশুপালন প্রভৃতির সামনে বিরাট সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রসার ঘটতে শুরু করলে আপনা থেকেই 'কোল্ড চেন' এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় নতুন নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে। এমন উর্বর কৃষি জমি থাকায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ গোটা দুনিয়ায় খাদ্য সামগ্রী রপ্তানিতে পশ্চিমবঙ্গের উলেখযোগ্য ভূমিকা না নিতে পারার কোনও কারণ নেই। এই সম্ভাবনাকে সফল করে তুলতে আমেরিকার বহু খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুতকারক সংস্থা পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে প্রস্তুত। কোকাকোলা, পেপসিকো, হেইনজ এবং আরও অনেক সংস্থা হয় ইতিমধ্যেই এই রাজ্যে ব্যবসা শুরু করেছে, অথবা খুব শীঘ্রই তা করতে চলেছে। আর এই সব সংস্থা যখন আসবে তখন তারা এখানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং ব্যবসায়িক রীতিনীতির সূচনা করা ছাড়াও পরিবেশ সুরক্ষার দিকটিও সুনিশ্চিত করবে -- যেমনটি করা হয় আমেরিকায়।

এই বিষয়টিই আমাকে নিয়ে এল 'একক সাফল্যের কাহিনী'তে যে কথা আমি আমার বক্তব্যের গোড়ায় উলেখ করেছি।

পেপসিকো-র ফ্রিটো-লে বিভাগ পশ্চিমবঙ্গে নতুন যে বিনিয়োগ করতে চলেছে সে খবর মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন। এটি অত্যন্ত সুসংবাদ এবং আমরা আশা করতে পারি, ভবিষ্যতে এটি আরও অনেক উলেখযোগ্য বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করবে। ফ্রিটো-লে ইন্ডিয়া হল পেপসিকোর স্ন্যাক ফুড ডিভিশন যার বিপণনের বহর আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন দেশে প্রসারিত। ভারতে ফ্রিটো-লে নানান শক্তিশালী ব্র্যান্ডনেম যেমন লেজ, আঙ্কল চিপস, কুরকুরে, টুইসটিজ, চিটুজ ইত্যাদির মোড়কে বিভিন্ন ধরনের আলুভাজা ও নোনতা খাবার তৈরি করে। এখন পর্যন্ত ফ্রিটো-লে ইন্ডিয়ার দুটি উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। প্রথমটি স্থাপিত হয়েছে পাঞ্জাবে ১৯৮৯ সালে এবং দ্বিতীয়টি ২০০০ সালে মহারাষ্ট্রে। ফ্রিটো-লে ইন্ডিয়া এখন পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ একটি উৎপাদন কেন্দ্র গড়তে চায়। সেক্ষেত্রে দারুন লাভবান হবেন রাজ্যের আলুচাষীরা -- যাঁরা বছরের পর বছর ধরে প্রচুর পরিমাণ আলুর ফলন সুনিশ্চিত করে চলেছেন। এর নিকটতম বৃহৎ বাজার রয়েছে এই কলকাতাতেই -- যা প্রকৃতপক্ষে চটজলদি খাবারের বিরাট এক বাজার এবং যেখানে বিস্কুট, দুগ্ধজাত দ্রব্য, কেচাপ, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আটা ও ভোজ্য তেল সহ বিভিন্ন শ্রেণির পণ্যও উলেখযোগ্য বিক্রি হয়।

দীর্ঘ মেয়াদের হিসাবে কলকাতার কেন্দ্রটি থেকে ফ্রিটো-লে স্ন্যাক ফুডের সব গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ডই তৈরি হবে। প্রাথমিক ভাবে অবশ্য এখান থেকে সংস্থার দুটি সবচেয়ে শক্তিশালী ব্র্যান্ড -- লেইজ এবং কুরকুরে উৎপাদন করা হবে। এজন্য মোট মূলধনী বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ ডলার বা প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে রয়েছে জমির দাম, বাড়ি তৈরি, মেশিন ও যন্ত্রপাতি সহ নিকাশী জল শোধনের বন্দোবস্তের যাবতীয় খরচ। নতুন কারখানা তৈরির কাজ সংস্থাটি শীঘ্রই শুরু করবে এবং ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই সেখানে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ৫৫ লক্ষ ডলার বা ২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হতে পারে। এছাড়াও ফ্রিটো-লে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় বেশ কয়েকটি জেলায় কৃষি কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। যৌথ প্রয়াসে উদ্ভাবিত এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হল স্থানীয় চাষ-আবাদের মান উন্নত করে আলুর ফলনকে প্রক্রিয়াকরণের উপযোগী করে তোলা। অধিকতর মানোন্নয়ন ও স্ব-নির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতের আলু নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ আলুর শতকরা ১০০ ভাগ যোগান পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংস্থান করতে ফ্রিটো-লের প্রায় দুই-তিন বছর লাগবে। যতক্ষণ তা না হয় ততদিন সংস্থাটি স্থানীয় সম্পদ গড়ে তোলা ও চাষীদের প্রয়োজনীয় তালিম দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করে চলবে।

পরিশেষে আমি কৃষি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহুস্তরীয় আলোচনা এবং দোহা বৈঠকের বৃহত্তর প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলব।

এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সাধারণত আমি কৃষিতে মার্কিন ভরতুকির বহর নিয়ে কট্টর সমালোচনা শুনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কৃষিতে ভরতুকি দেয় তা কোনও গোপন কথা নয় এবং আমি তা অস্বীকারও করব না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু মুক্ত বাণিজ্যের পথ প্রদর্শক এবং এই মতবাদে গভীর ভাবে বিশ্বাসী তাই বলতে বাধা নেই, ভরতুকির বিষয়টি কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের অস্বস্তিতে ফেলে ঠিকই। কিন্তু মুক্ত বাণিজ্য অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি না আপনারও মোটামুটি ভাল বাণিজ্য করার সুযোগ থাকে। এই

মুহূর্তে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে নানারকম বাধা রয়েছে -- তা ভরতুকি হোক কিংবা শুল্ক অথবা নানান বিধিনিষেধ -- যার দরুন কৃষি বাণিজ্য অবাধ ও মুক্ত নয়। বিষয়টি হল এরকম: যদি কোনও একটি দেশ এই সব বাধা সরিয়ে দেয় আর অন্যেরা তা বহাল রাখে তাহলে সেই দেশটি চরম অসুবিধার সম্মুখীন হবে। বহুস্তরীয় আলোচনার প্রয়োজন এখানেই। এর ফলে প্রত্যাশা মতো সব ধরনের বিধিনিষেধের বহর কমতে কমতে ক্রমে অবাধ ও মুক্ত বাণিজ্যের পথ সুগম হবে।

যাঁরা এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করেন তাঁদের অধিকাংশই জানেন না আমাদের প্রাথমিক প্রস্তাব কী ছিল। আপনারা জানেন? প্রথমে আমরা চেয়েছিলাম কৃষিক্ষেত্রে ভরতুকির পরিমাণ শূন্যতে নামিয়ে আনতে। হ্যাঁ ঠিকই, শূন্যতে। কিন্তু অবশ্যই আমরা একক ভাবে এরকম চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে প্রস্তুত নই যতক্ষণ না অন্য সকলেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নাটকীয় প্রস্তাব দেয়। যখন তা হল না তখন আমরা নিজেদের প্রস্তাব সংশোধন করলাম। তবে আমার মনে হয়, আপনাদের জানা জরুরী যে কোথায় আমরা শুরু করেছিলাম।

অবশেষে একটি কথা: আমার বিশ্বাস, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে যৌথভাবে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। জমির উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতার সুবাদে ভারতে কৃষি উৎপাদনের খরচ কম এবং খাদ্য রপ্তানিকারক হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও এই দেশের রয়েছে। কিছু কিছু খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে রপ্তানি লাভজনক না হলেও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী নিশ্চয়ই আয়ের নতুন নতুন পথ খুলে দেবে। আমরা বার বার বলেছি, অন্যেরা যদি 'করতে পারি' মনোভাব দেখায় তাহলে আমরাও তার জবাবে 'করে দেখাব' মনোভাব প্রদর্শন করতে পারি। এখন যা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তা হল, এই বিষয়ে পারস্পরিক বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করার বদলে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অচিরেই জোটবদ্ধ ভাবে কাজ করে দুনিয়া জুড়ে আরও অবাধ ও যুক্তি সঙ্গত কৃষি বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারে। সেটা হবে আমাদের সকলের পক্ষে এক স্বাগত ঘটনা।

আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

****